মাটির গড়া এই ধরণী





ননীগোপাল গোস্বামী

মাটির গড়া এই ধরণী

শ্রীননীগোপাল গোস্বামী

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলিকাতা বারো

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৬৭

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—শ্রীকালীপদ নাথ
নাথ ব্রাদার্স প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
৬ চালতাবাগান লেন,
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট
সুধাময় দাশগুপ্ত

এক টাকা

উৎসর্গ

পশ্চিম বঙ্গের কৃষি-অধিকর্তা

ভারত বিখ্যাত কৃষি-বিজ্ঞানী

ডক্টর হীরেন্দ্রকুমার নন্দী

মাননীয়েষু

বিনীত—

ননীগোপাল গোস্বামী

এই লেখকের লেখা—

* সবে মিলি করি কাজ
* আমাদের উৎসব
* বৈষ্ণবাচার্য বিশ্বনাথ

নিবেদন

আমাদের বাস এই ধরণীতে। ধরণী মাটির গড়া। মাটির কোলে বসবাস করেই গড়ে উঠেছে আমাদের এই সুদীর্ঘকালের জীবনযাত্রা। মাটির বুক থেকে ফসল নিয়ে পাই আমাদের রোজের খাবার; মাটির কোলেই গড়ে ওঠে আমাদের নগর-বাজার, মাটি নিয়েই করি আমরা ঝগড়া-মারামারি, আবার জীবন শেষে এই মাটির কোলেই লুটিয়ে পড়ি। তাইতো মাটির টানেই আমাদের জীবন বাঁধা।

বহু বৈচিত্র্যে ভরা সেই মাটির কথাই বলা হয়েছে এই গ্রন্থে। সংসারে বেঁচে থাকতে হলে আহারের জন্যে মাটির বুক চিরে যে সব ফসল আমরা পাই, তাও বলা হয়েছে যথাস্থানে।

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি-অধিকারের কৃষি-অধ্যক্ষ শ্রীসুশীলচন্দ্র চক্রবর্তী গ্রন্থের অনেকাংশ পরিশোধিত করে দিয়ে আমার অশেষ উপকার করেছেন। এজন্য তাঁর কাছে জানাই আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা।

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকারের সমাজ-শিক্ষা শাখার সহকারী প্রধান পরিদর্শক শ্রীমন্মথনাথ রায় এই গ্রন্থ রচনায় আমাকে যে ভাবে উৎসাহ ও উপদেশ দিয়েছেন, তার অভাব হলে যে গ্রন্থখানির আত্ম প্রকাশ সম্ভবপর হত না, তা বলাই বাহুল্য।

গ্রন্থখানি যথাসম্ভব সহজ ও সরল ভাষায় পশ্চিমবঙ্গ সমাজ শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্রবৃন্দের পাঠোপযোগী করে রচনা করতে প্রয়াস পেলাম। এখানি পাঠে কারও সামান্য উপকার হলেও আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

বিনীত—
শ্রীননীগোপাল গোস্বামী

কলিকাতা, আশ্বিন ৩৬৭

এই বইতে আছে—

মাটির গড়া এই ধরণী

এক

পৃথিবীর জন্ম

এমন একটা সময় ছিল যখন মাটি তো দূরে থাক, পৃথিবীই ছিল না।

তখন ছিল আকাশের গায়ে বিরাট এক আগুনের গোলা। দিন-রাত সেটা শুধু ঘুরপাক খেত। সেটা যে কত বড়, আর কত গরম—তা' বুঝিয়ে বলবার নয়। তার সবটাই ছিল একটা জ্বলন্ত আগুন।

একদিন হ'ল কি—খুব বড় একটা তারা গেল গোলাটির পাশ দিয়ে চলে। ফলে তার আকর্ষণে গোলাটির একটা টুকরো এলো ছিটকে বেরিয়ে।

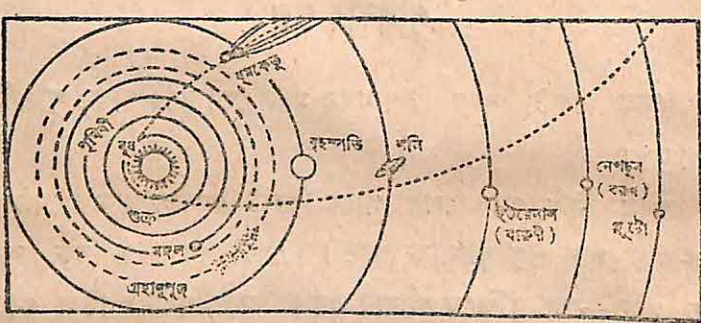
যে টুকরোটি ছিটকে এলো, তার চেহারা ঠিক একটা পটোলের মতো।

ছিটকে পড়েই টুকরোটি ধীরে ধীরে জমাট বাঁধতে লাগলো। তারপর গেল ওটা আবার কয়েক টুকরো হয়ে ভেঙে।

এই টুকরোগুলো হল এক-একটি গ্রহ, আর এদের ভেতর একটি টুকরো হল আমাদের পৃথিবী। সেই থেকে টুকরোগুলো নিজ নিজ পথ ধরে নিয়ত সেই আগুনের বড় গোলাটির চারধারে ঘুরে চলেছে।

এই সময় ঘটলো আর এক ঘটনা। যে টুকরোটি হল আমাদের পৃথিবী, তার গা থেকে হঠাৎ একটা অংশ ছুটে বেরিয়ে গেল। এইটিই আমাদের চাঁদা মামা—যাকে আজও আমরা ছোট সময়ে হাত বাড়িয়ে ধরতে যাই।

আর ওই যে আগুনের বড় গোলা, যার টুকরো থেকে পেলাম আমাদের পৃথিবীকে, সেই হল আমাদের সূর্য।



সৌর জগৎ

আদি সূর্য থেকে যেমন পৃথিবী বেরিয়ে এসেছে, তেমনি আদিম পৃথিবী থেকে বেরিয়ে এসেছে চাঁদ। তারপর পৃথিবীর টানে সেটি পৃথিবীরই চারদিকে ঘুরছে।

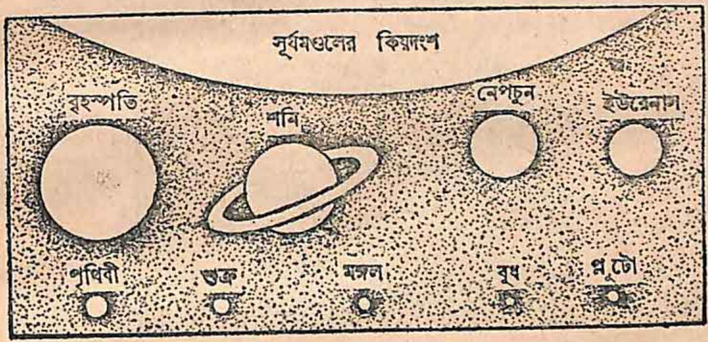
এখন দেখা যাক, যে টুকরো থেকে পেলাম আমাদের পৃথিবীকে, তার কি হল।

কথা ওঠে—যেমনটি আমরা আজ পৃথিবীকে দেখছি, তখন থেকে কি সে এই রকমই রয়ে গেছে?

তাও কি কখনও হয় ?

যে টুকরো থেকে হল পৃথিবী, সেটি তো একটা আগুনের ডেলা। আদিম পৃথিবীর সেরূপ ভাবতেও তো ভয় হয়। তাতে কি কোন গাছপালাই হয়, না জীবজানোয়ারই বাঁচে ?

তবে হল কি—না, এই টুকরোটির ওপরটা ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে শক্ত হ'ল, আর ভিতরের দিকটা ক্রমে নিরেট হোতে থাকল।



শক্ত হবার সময় টুকরোটির ওপর দুধের সরের মতো একটা পাতলা আবরণ পড়ে গেল।

দুধের সর ঠাণ্ডা হবার সময় যেমন কুঁচকে যায়, পৃথিবীর ওপরটা ঠাণ্ডা হোতে হোতে তেমনি কুঁচকে যেতে লাগল। কুঁচকে গেলে দুধের সর যেটুকু অসমান হয় তাতো আমরা ধরিই না। কিন্তু কুঁচকে-যাওয়া পৃথিবীর ওপরের উঁচু-নিচু সেইরকম সামান্য বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পৃথিবীর নিচের দিকটা তার ওপরের উঁচু-নিচুর ভার সইবার মতো খুব পাকা হয়নি। তাই ভাল নির্ভর না পাওয়ায় ওপরের শক্ত স্তরটা ভেঙে তুবড়ে

উঁচু-নিচু হ'ল। ফলে উঁচু জায়গায় দেখা দিল পাহাড়-পর্বত, আর নিচু জায়গাগুলো হ'ল কালে কালে সাগর বা মহাসাগরে পরিণত।

পৃথিবীর গায়ের যে আবরণ, তা' এখন বেশ শক্ত হয়ে দেখা



সাগর

দিয়েছে। জীব-জানোয়ারের গায়ের চামড়ার মতো, পৃথিবীর এই আবরণ তার ভেতরের পদার্থ রেখেছে ঢেকে।

এই আবরণের ওপরই আমাদের বাস—সেখানেই আছে মাটি, আর তাই চষে ফসল ফলিয়ে করি আমরা আহারের পরিপাটি।

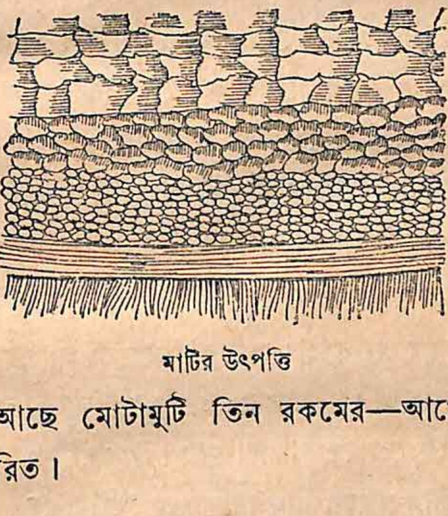
দুই

শিলা

পৃথিবীর গায়ের আবরণের ওপর মাটি এলো কোথা থেকে ?

সে এক মজার কাহিনী।

যে সব জিনিস দিয়ে আবরণ তৈরি হয়েছে, তাকে আমরা সাধারণ কথায় বলি 'শিলা'। 'শিলা' বললে আমরা বুঝি কোনো কঠিন জিনিস। কিন্তু ভূ-বিজ্ঞানে বালি, কাঁকর, নুড়ি, পাথর, কাদা, মাটি—এ সবগুলোকেই শিলা বলা হয়েছে।



মাটির উৎপত্তি

শিলা আছে মোটামুটি তিন রকমের—আগ্নেয়, পাললিক আর রূপান্তরিত।

আগ্নেয় শিলা

এইটিই হল পৃথিবীর আদিম বহিরাবরণ। গরম পৃথিবী শীতল হবার সময় তার চারদিকে যে কঠিন শিলা তৈরি হয়, তারই নাম আগ্নেয় শিলা। গরম গলা জিনিস জমে গিয়ে এই শিলা তৈরি হয়েছে বলে এর নাম আগ্নেয় শিলা। শহরের রাস্তা যে পাথর দিয়ে মেরামত হয়, তা' হ'ল পৃথিবীর এই আদিম শিলারই টুকরো।

পাললিক শিলা

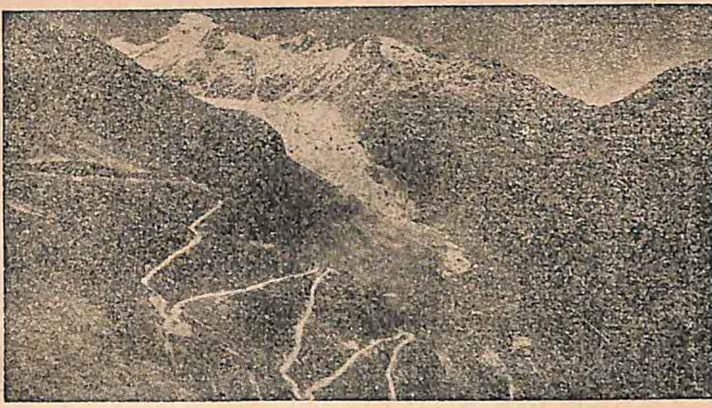
চোখে দেখা না গেলেও সব সময়েই পৃথিবীর উপরিভাগের রূপটা চলেছে একটু একটু করে বদলে। রোদ, বাতাস, ঝড়, জল—এরা পৃথিবীর উপরিভাগকে রোজ রোজ একটু একটু ক্ষয় করে নিয়ে করছে আবর্জনার তৈরি। তারপর এগুলো নদীর জলে ভেসে গিয়ে সাগর বা হ্রদের তলায় পলি মাটির মতো জমা হয়। বহুকাল ধরে এইরকম অনেক স্তর জমা হলে, ওপরের স্তরের চাপে নিচের স্তরগুলো জমাট বেঁধে পাথর হয়ে যায়। পলিমাটি থেকে এর জন্ম বলে নাম 'পাললিক' শিলা।

আবার আর এক ভাবেও এই শিলা তৈরি হয়। সাগরে আছে ছোট বড় অনেক জীব জানোয়ার। তারা মরে গেলে তাদের হাড়, কাঁটা, খোলা প্রভৃতি হাজার হাজার বছর ধরে জমাট বেঁধে কঠিন ও উঁচু হতে থাকে। এইভাবে তৈরি হয় চুনা পাথর বা খড়ি পাথর। এরা যে এককালে জলের নিচে ছিল তা আমরা বেশ সহজেই বুঝতে পারি। কেননা এর গায়ে নানা রকম জীব-দেহ পাথর হয়ে গেছে দেখতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীরা এই সব পাথর হয়ে যাওয়া জীব-দেহের নাম দিয়েছেন "জীবাশ্ম"।

শুনলে অবাক হতে হয় যে, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পর্বত যে হিমালয় তাও লাখ লাখ বছর ধরে সাগরতলে জমা পলি দিয়েই তৈরি।

আবার অনেক অনেক বছর আগে বহু বড় বড় গাছ-পালা ভূমিকম্পে মাটির তলায় চাপা পড়ে গিয়েছিল। হাজার হাজার বছরের তাপে ও মাটির চাপে এই সব গাছও শিলা হয়ে দেখা দিয়েছে। এইগুলোই আমাদের পাথুরে-কয়লা।

অনেক দিন ধরে খুব বেশি চাপ পেলে পাথুরে কয়লা 'গ্রাফাইট' নামে এক রকম নরম শিলায় পরিণত হয়।



হিমালয়

আমরা যে কাঠ পেন্সিলে লিখি তার শিষ এই গ্রাফাইট শিলা থেকেই তৈরি।

রূপান্তরিত শিলা

বেশি চাপ বা গরমে আগ্নেয় বা পাললিক শিলার রূপ যায় বদলে। তখন একে বলে 'রূপান্তরিত শিলা'। চুন আর হলুদ এক সাথে মিশালে যেমন একটা আলাদা রংয়ের জিনিস হয়, সেই রকম এই রূপান্তরিত শিলা আগ্নেয় ও পাললিক শিলা থেকে তৈরি হয়ে হয় একটা নতুন রকমের শিলা। এই ভাবে চুনা-পাথর মার্বেলে, বেলে-পাথর স্ফটিকেএবং কাদা-পাথর শ্লেটে পরিণত হয়। তখনই হয় এগুলো রূপান্তরিত শিলা।

হীরে বা অন্যান্য দামী পাথর রূপান্তরিত শিলার টুকরো ছাড়া আর কিছুই নয়।

তিন

মাটির উৎপত্তি

আগেই বলেছি পৃথিবীর গায়ের আবরণের ওপর রয়েছে মাটি। কি করে এখানে মাটি এলো সেই কথা আরও পরিষ্কার করে বলছি।

পৃথিবীর আদিম অবস্থায় তার উপরিভাগ কঠিন শিলায় ঢাকা ছিল। যুগ যুগ ধরে সেই শিলার রূপ গেলো বদলে। তারই ফলে পৃথিবীময় হল মাটির জন্ম।

সাধারণত তিনটি কারণে শিলা গেছে মাটি হয়ে—

(ক) **প্রাকৃতিক প্রভাব**—ঠাণ্ডা, গরম, ঝড়, বৃষ্টি প্রভৃতি নানা রকম প্রাকৃতিক প্রভাবে পাহাড়-পর্বতের পাথর গেল ভেঙ্গে গলে। তারই ছোট ছোট কণা থেকে জন্মালো মাটি।

(খ) **রাসায়নিক প্রভাব**—অক্সিজেন, কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস, ধাতবলবণ প্রভৃতির প্রভাবে কঠিন শিলা ক্রমে মাটি হয়ে যায়।

(গ) বড় বড় গাছের শিকড় অনেক সময় শিলাকে গুঁড়ো করে ও ক্রমে তা' মাটি হয়ে যায়।

এ ছাড়া জীব-জানোয়ার ও গাছ-পালা প'চেও মাটি তৈরি হয়।

এ থেকে দেখা গেল, প্রধানত পাথর থেকেই হল মাটির জন্ম। পাহাড়-পর্বতের শিলা জল বায়ু তাপ ও তুষারের

চাপে ক্ষয়ে হল ছোট ছোট কণা। সেই কণা পাথরে থাকবার সময় যেমন তার সাথে কঠিন ভাবে মিশে থাকে পাথর থেকে আলাদা হয়ে গেলে সেই ভাবে আর থাকতে পারে না। ক্রমে রাশি রাশি কণা পড়ে ছড়িয়ে, আর তৈরি হয় এক একটি স্তর। একটি যখন ওঠে গ'ড়ে, তখন তার ওপর জন্ম হয় নানা রকম গাছপালার। কালে যখন হয় এরা ধ্বংস, তখন সেই অবশেষ এক-এক স্তরের পাথর-কণায় মিশে মাটি হয়ে যায়।

কোন কোন জায়গায় পাহাড়-পর্বত থেকে মাটি হয়ে তারই কাছে রয়ে যায়। এই সব মাটির রং, প্রকৃতি ও গুণ সমতল-ভূভাগের মাটি থেকে আলাদা। আমরা সাধারণত একে বলি 'পাহাড়ে-মাটি।' বিজ্ঞান একে **'স্থিতিশীল মাটি'** (Sedentary Soil) নামে অভিহিত করেছে।

কোন জায়গার মাটি আবার পাহাড় থেকে অনেক দূরে যায় সরে—জল-বাতাসের টানে। পাহাড়ের কোল্ থেকে মাটি যখন জলের স্রোতে ভেসে দূরে চলে যায়, তখন পাথরের কণাগুলি নিজেদের গায়ের ঘসায় যায় আরো ছোট হয়ে, আর স্রোতের কম-বেশির ফলে জলের তলে যায় পড়ে। এই হ'ল আমাদের 'পলিমাটি'। চাষবাসের কাজে এই মাটিই সবার সেরা। বানের সময় নদীর জল যখন একূল-ওকূল ভাসিয়ে নেয়, তখন জলে-মেশানো এই পলিমাটি ক্ষেতের ওপর প'ড়ে জমির উর্বরতা আরো বাড়িয়ে দেয়।

ঝড়-বাতাসেও মাটি ও পাথর-কণা নানা জায়গায় ছড়িয়ে প'ড়ে মাটি হয়ে যায়। সাগরের কাছাকাছি জায়গায় সাধারণত এই রকম মাটি দেখা যায়। এই মাটিতে জৈবিক ভাগ কম, পাথরের

ভাগ বেশি। একে বলা হয় 'বালি' মাটি। এই বালি ছোট ছোট পাথরের কণা ছাড়া আর কিছু নয়।

সাধারণত মাটি গ'ড়ে ওঠে জল, বাতাস, গরম ও ঠাণ্ডায়। কোন কোন জায়গায় কোন কোন সময়ে আবার জীবাণু থেকেও মাটির নানারকম স্তর গ'ড়ে ওঠে। পাটল-মাটি (Laterite) এই রকম জীবাণুর তৈরি।

সমুদ্রে একরকম জলজ কীট আছে। তার নাম প্রবাল। এরই হাড়-গোড় থেকে পাটল-মাটির জন্ম।

এইভাবে এক-একটা দ্বীপ উঠেছে গ'ড়ে, যেমন দেখা যায় ভারত মহাসাগরের লাক্ষা ও মালদ্বীপ পুঞ্জ।

ওপরের স্তরে যে মাটি দেখা যায়, তার গুণ নিচের স্তরের মাটি থেকে আলাদা। ওপরের মাটি নিয়ত আলো বাতাসে ক্ষয়ে যায়। নিচের মাটি তা' হতে পারেনা। তাই ওপরের মাটির কণা নিচের মাটির কণার চেয়ে ছোট। ওপরের মাটি উঠিয়ে নিচেয় আবার কিছুদিন ধরে আলগা করে রাখলে এগুলোও ঠিক ওপরের মাটির মতোই হয়ে ওঠে।

সাধারণত মাটিতে দেখা যায় বালি, পলি, কাদা, চুন আর জৈবিক পদার্থ।

বালি, পলি আর জৈবিক পদার্থ কি ভাবে মাটিতে মিশেছে তা' আগে বলেছি। কাদাও পাথরের ছোট ছোট কণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

কাদার ছোট ছোট কণা নিজেদের মধ্যে দৃঢ় ভাবে মিশে থাকে কিন্তু বালির তা' থাকে না। এক মুঠো বালি হাতে চেপে ধরলেই তা বোঝা যায়। বালি মুঠ করে ধরলে তা' ডেলা পাকিয়ে যায়, মুঠ খুললেই আবার আলাদা হয়ে পড়ে। কাদা

মুঠ করে ধরলে তো তা' হয় না—অমনি ডেলা পাকিয়ে যায়। দেখা গিয়েছে বালির কণা পাশাপাশি সাজিয়ে রাখলে ৫০০-১০০০ কণা সাজাতে একইঞ্চি লম্বা জায়গা লাগে। এই জায়গায় কাদার কণা সাজানো যায় ২৫০০০। এ থেকেই বোঝা যায় বালির কণার চেয়ে কাদার কণা কত ছোট।

চুন মাটিতে খুব কম আছে। এর প্রধান কাজ হল প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ পচিয়ে জৈবিক পদার্থ তৈরি করা।

চার
মাটির প্রকৃতি

মাটিতে মোটামুটি যা যা আছে তা' বলা হ'ল। এইবার দেখা যাক আরো কিছু আছে কিনা।

মাটিতে আছে জল, বায়ু ও তাপ। এইগুলো দরকার হয় গাছপালার উৎপত্তি আর জীবন ধারণের জন্যে।

বড় মজার কথা এটা—তাই না? বলি—মাটিতে আবার জল, বাতাস ও গরম ঢুকলো কি করে?

সেই কথাই এবার বলছি।

কতকগুলো ছোট-বড়ো কণা দিয়েই হয়েছে মাটি তৈরি। মাটির জল শোষণ ও ধারণের ক্ষমতা নির্ভর করে এই কণার আয়তনের ওপর।

সব মাটির কণার মধ্যেই ফাঁক আছে। এই ফাঁক দিয়ে জল যায় মাটির ভেতর। ফাঁকগুলি থাকে সব সময়েই বায়ুতে পরিপূর্ণ। জল যখন এই ফাঁক দিয়ে মাটির ভেতর যায়, তখন

জলের চাপে বাতাস যায় সরে। জল চলে গেলেই আবার সেখানে বায়ু এসে দখল করে।

যে মাটির কণা যত বড়, তার ভেতর জলের মতো বাতাস যাবার পথও তত বড়। বড় কণার মাটির রস-ধারণের ক্ষমতা সেইজন্য কম।

মাটির ভেতর যে জল থাকে, তা' এক আকর্ষণের বলে গাছপালার শিকড়ের কাছে আসে। এর নাম 'কৈশিক আকর্ষণ'।

শুনলে অবাক হতে হয়, এই কৈশিক আকর্ষণের বলেই প্রদীপের সল্‌তে তেল টেনে নিতে পারে।

যে মাটির কণা যত ছোট, সেই মাটির কৈশিক আকর্ষণের শক্তি তত বেশি। আবার যে মাটিতে জৈবিক পদার্থের ভাগ বেশি, সেই মাটিতেও এই শক্তি খুব বেশি।

এইবার বলছি মাটির আর একটি ক্ষমতার কথা। এর নাম 'আদ্রতা-গ্রাহী' ক্ষমতা।

মাটিতে যে জল আছে রোদের তাপে তা' বাষ্প হয়ে ওপরে উঠে যায়। কিন্তু মাটি তার আর্দ্রতা-গ্রাহী ক্ষমতারবলে, তার ওপরে যে জলীয়-বাষ্প পড়ে, তা' থেকে কতকটা জলীয়-ভাগ টেনে নেয়। সেই জন্যেই দেখা যায়, মাটির প্রতিটি কণার গায়ে জড়িয়ে আছে একটি করে জলের পাতলা আবরণ।

এখন দেখা যাক, মাটির তাপ আসে কোথা থেকে!

মাটির এই তাপ হয় প্রধানত তিনটি কারণে—

১। রোদের তাপ, ২। ভূ-গর্ভের ভেতরের তাপ,
৩। রাসায়নিক তাপ।

মাটির ভেতর আছে জৈবিক পদার্থ। তা' থেকেই শেষের তাপটি উৎপন্ন হয়। এরই গরম বেশি।

দিনের বেলায় মাটি পায় রোদের তাপ। রাতে দেয় তা' বের করে। এই জন্যে দিন-রাতে মাটির তাপ কম-বেশি হবার কথা। কিন্তু ভূ-গর্ভের তাপ এসে ওই নষ্ট উত্তাপের খানিকটা দেয় পূরণ করে।

এই কারণেই বাতাসের তাপের চেয়ে মাটির তাপ বেশি। যে মাটির যত কম তাপ, রোদের তাপে সেই মাটি তত বেশি গরম হয়। যে মাটির জল ধরে রাখবার ক্ষমতা বেশি, তার তাপ ধরে রাখবার ক্ষমতাও বেশি।

পাঁচ
মাটির উপাদান

যে যে জিনিসে মাটি তৈরি হয়েছে, তা' বলেছি। এখন দেখা যাক, মাটিতে ধাতব পদার্থ কিছু আছে কিনা।

হ্যাঁ, আছে বৈকি!

জৈবিক পদার্থের চেয়ে ধাতব পদার্থই তো মাটিতে বেশি পাওয়া যায়। গাছ পোড়ালেই দেখা যায় যে, তা'র ভেতর ধাতব পদার্থের ভাগই বেশি।

মাটিতে বেশি করে ধাতব পদার্থ থাকলেই যে মাটি উর্বরা হয়, তা' নয়। তবে এদের মিলনের ওপর জমির উর্বরতা বেশ কিছুটা নির্ভর করে। এর মানে—ধাতব পদার্থগুলো এমন ভাবে মিলে থাকবে যেন গাছ তা' অনায়াসে জলের সাহায্যে শিকড় দিয়ে টেনে নিতে পারে।

উর্বরা জমিতে যে সব উপাদান থাকা দরকার, তা' হল—

১। যবক্ষারজান	৩। অক্সিজেন
২। কার্বন	৪। হাইড্রোজেন

এগুলো সবই পাওয়া যায় মরা জীবজানোয়ার ও গাছপালা থেকে। মাটিতে এরা সবই থাকে একসাথে মিলিত হয়ে।

মজার কথা এই যে, এই রকম মিলিত হয়ে থেকেও এরা গাছের খাদ্যের পক্ষে কোনরকম উপকারে আসে না।

জৈব পদার্থগুলো পচতে থাকলে কতকগুলো পদার্থের তৈরি হয়। আর এই সব নতুন পদার্থ এক সাথে মিশে **'হিউমাস'** নামে এক রকম কালো রঙের জৈব পদার্থ তৈরি হয়।

এই হিউমাসের ভেতর থেকে অবশেষে যবক্ষার জাতীয় এক রকম খাবার তৈরি হয়। গাছ শিকড় দিয়ে তখন তা' অনায়াসে টেনে নিতে পারে। এই হিউমাসের বলেই মাটির রস-ধারণের ক্ষমতা বাড়ে, সূর্যের তাপ ধরে রাখবার ক্ষমতা বাড়ে। আর মাটিকে রাখে এরা আল্‌গা। ফলে মাটি সহজেই শুকিয়ে যায় না, জমি চষতেও অসুবিধা হয় না।

এইবার দেখা যাক, মাটিতে সব সমেত কি কি উপাদান আছে—

১। পাথরের গুঁড়ো,

২। জীব জানোয়ার ও গাছপালা পচা,

৩। 'ব্যাকটিরিয়া প্রোটোজোয়া' নামে এক রকম খুব ছোট জীবাণু, যা' সাধারন চোখে দেখা যায় না,

৪। জল,

৫। বায়ু।

এই সব উপকরণ আবার মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

১। জৈব পদার্থ ও

২। ধাতব পদার্থ।

জৈব পদার্থ

এর উপাদানগুলি সব মরা জীবজানোয়ার আর গাছ-গাছড়া। জৈব পদার্থে যে সব উপাদান থাকে, তা' হল—

১। নাইট্রোজেন ২। কার্বন
৩। অক্সিজেন ও ৪। হাইড্রোজেন।

ধাতব পদার্থ

ধাতব পদার্থ হচ্ছে—

১। সিলিকা ৬। পটাশ
২। লোহা ৭। সালফার
৩। অ্যালুমিনিয়ম ৮। ফস্‌ফরাস
৪। ম্যাগনেসিয়াম ৯। ক্যালসিয়ম
৫। সোডিয়াম ১০। ক্লোরিন।

এই সব উপাদানের সবই পাওয়া যায় পাথরের গুঁড়োয়।

ছয়

মাটির রকম ভেদ

সব জায়গার মাটি সমান হয় না। আমরা দেখেছি মাটির ভেতর নানা রকম পদার্থ আছে। এইগুলির পরিমাণ হিসেবে মাটির রকমভেদ হ'য়ে থাকে।

সব মাটিতেই সব রকমের গাছপালা বা ফসল হয় না। উঁচু জমিতে যে ফসল হয়, নিচু জমিতে তা' হয় না। নদীর চরে যে ফসল জন্মে, বাগানে তা' জন্মে না। ভিন্ন ভিন্ন মাটির উর্বরতার

মধ্যেও তফাত আছে। এই সব বিচার করে মাটির মধ্যে মোটামুটি যে সব ভাগ করা হয়েছে, সেই কথা বলছি—

কাদামাটি

এই রকমের মাটি নদীতে দেখা যায়। এই মাটিতে ¾ কাদা থাকে। এর জল ধারণের ক্ষমতা খুব বেশি।

বালিমাটি

শোন, মহানদী, দামোদর প্রভৃতি নদীর তলে ও সাগরের ধারে খাঁটি বালি দেখতে পাওয়া যায়। খাঁটি বালির আঠা নেই। সেই জন্যে জল দিয়ে তাল পাকান যায় না। এই মাটি স্বভাবতই আলগা। এতে জল মোটেই দাঁড়ায় না। কোনো ফুটো বাসনে বালি রেখে তার ওপর জল দিলেই দেখা যায়, জল বালিতে ঢুকে ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। চালুনীর ওপর জল ঢাললে যেমন সব জল ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যায়, এক ফোঁটাও দাঁড়ায় না, বালিতেও সেই রকম। বালি-মাটিতে রস থাকে না বলে চাষবাসের কাজ এতে চলে না। তবে এই মাটিতে পলি পড়লে কাঁকুড়, তরমুজ, পটল প্রভৃতির চাষ করা চলে।

এঁটেল মাটি

এঁটেল মাটির প্রকৃতি বালির ঠিক বিপরীত। এই মাটিতে জল দিলে, অনায়াসে তাল পাকান যায়। এ থেকে বোঝা যায়, এঁটেল মাটিতে বেশ আঠা আছে। এই জন্যে এঁটেল মাটি দিয়ে কুমোররা মাটির বাসন তৈরি করে। এঁটেলের কণাগুলো খুব মিহি। এই জন্যেই এই মাটি ভিজালে খুব চট্‌চটে ও আঁট হয়। এতে প্রচুর পরিমাণ জল আট্‌কে থাকতে পারে।

খাঁটি বালির মতো খাঁটি এঁটেল মাটিতেও চাষবাসের কাজ

চলে না। কারণ এই মাটিতে বেশি জল জমলে তার ভেতর হাওয়া যেতে পারে না। আবার জল শুকালে এই মাটি এত শক্ত হয় যে, গাছপালার শিকড় মাটি ভেদ করে নিচে যেতে পারে না।

দো-আঁশ মাটি

এই মাটিতে শতকরা ৪০ ভাগ থেকে ৭০ ভাগ কাদা, আর বাকি অংশে থাকে বালি। চাষবাসের কাজে এই মাটি সব চেয়ে উপযোগী।

কাঁকর মাটি

এই মাটিতে কাঁকর বেশি থাকে। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম জেলায় এই মাটি বেশি দেখা যায়।

লাল মাটি

এই মাটিতে লোহার ভাগ বেশি। সে জন্যে এর রঙ হয় লাল।

সাত

গঙ্গা-হৃদি বঙ্গভূমি

মাটির গড়া এই দেশেই আমাদের বাস। চলতি কথায় এই দেশকে বলা হয় বাংলা দেশ।

এখন কথা হল—এই 'বাংলা' নামটা এলো কোথা থেকে ?

সেই কথাই এখন বলবো।

এই দেশের আসল নাম—বঙ্গ।

এই 'বঙ্গ' কথা থেকে 'বঙ্গাল', পরে 'বাঙ্গালা' এবং 'বাংলা'

হয়েছে। বহু প্রাচীন কাল থেকে বানের উৎপাতে আমাদের ভুগতে হয়। বানের জল আটকাবার জন্যে 'আল' দেওয়া অনেক কাল আগে থেকেই আমাদের দেশে চলিত ছিল। "বঙ্গ" আর 'আল'—এই দু'টি কথার যোগে 'বঙ্গাল' কথার তৈরি।

কিন্তু আমাদের দেশের নাম 'বঙ্গ' হল কেন?

এর কারণ খুঁজতে আমাদের আরও পুরাকালে যেতে হয়।

পুরাণে আছে, আগের কালে ভারতে দু'টি খুব বড় রাজবংশ ছিল। একটির নাম চন্দ্র বংশ, অপরটির নাম সূর্য বংশ। সূর্য বংশের বিখ্যাত রাজা—দশরথ, রামচন্দ্র। আর চন্দ্রবংশের বিখ্যাত রাজা—যুধিষ্ঠির। চন্দ্র বংশে এক রাজা ছিলেন। তাঁর নাম বলি। তাঁর ছিল পাঁচ ছেলে—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র এবং সুহ্ম। মরার সময় তিনি তাঁর রাজ্য এই পাঁচ ছেলের মধ্যে ভাগ করে দেন। কালে এই পাঁচজন রাজকুমারের নাম অনুসারে তাঁদের পাঁচজনের রাজ্যের নাম হয়—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম। রাজকুমার বঙ্গের নাম থেকেই বাংলাদেশের নাম হয় বঙ্গ।

এখন বাংলা দেশ বলতে আমরা যা বুঝি, তখনকার দিনে তা বোঝাত না। বহুবার এই দেশের সীমানা গেছে বদলে। শেষে এদেশ দু' ভাগে ভাগ হয়ে গড়ে উঠেছে পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব বাংলা।

আমাদের বাস পশ্চিম বাংলায়। এর উত্তরে হিমালয় পর্বত, দক্ষিণে সাগর জল, পশ্চিমে ছোটনাগপুরের দুর্গম পথ, আর পূর্বে আরাকানের নিবিড় বন। এই সাগর-পর্বত-বন আর দুর্গম পথের ভেতর রয়েছে আমাদের পশ্চিম বাংলা। হৃদয়ে তার গঙ্গার পুণ্য জলধারা তীরে তীরে অন্ন ও আয়ু পরিবেশন করে চলেছে। তাই আমাদের কবি বলেছেন—'গঙ্গা-হৃদি বঙ্গভূমি'।

আট

জমির রকম ভেদ

গঙ্গার পলি মাটিতেই গড়ে উঠেছে এই পশ্চিম বাংলা। এই মাটির টানেই বাঁধা পড়েছে আমাদের জীবন। চাষবাসই এদেশের লোকের খেয়ে পরে বাঁচবার প্রধান উপায়। চাষের জমিকে ঘিরে গড়ে উঠেছে গ্রাম। আর এক এক টুকরো জমি নিয়ে এক একটি পরিবারের পত্তন হয়েছে।

লেখাপড়া শেখা আর তীর্থে যাওয়া—এ ছাড়া বড় একটা কাউকে গাঁ ছেড়ে কোথাও যেতে হয়নি।

এই কৃষি-নির্ভর সমাজের পুরানো ইতিহাস জানতে হলে তার জমির ইতিহাসও একটু জানতে হয়।

আগের দিনে মোটামুটি চার রকমের জমি ছিল—বাস্তু, ক্ষেত্র, খিলক্ষেত্র ও খিল।

বাস্তু

যেখানে লোকে ঘর বাড়ি তুলে বাস করে তাকে বলে বাস্তু জমি।

ক্ষেত্রভূমি

যে জমিতে চাষ করা হয় তাকে বলে ক্ষেত্রভূমি। এই জমির আর এক নাম 'নালভূ'। আজকালও এই অর্থে আমরা 'নাল' জমি কথাটা ব্যবহার করে থাকি।

খিলক্ষেত্র

যে জমি চাষ করা যায়, অথচ চাষ না করে ফেলে রাখা হয়েছে তাকে বলা হত 'খিলক্ষেত্র'।

খিল

যে জমি চাষের অযোগ্য সেই জমিকে শুধু 'খিল' বলে বলা হয়েছে।

এছাড়া আরও কয়েক রকমের জমির নাম দেখা যায়। যে নালা বা নিচু জমির ওপর দিয়ে জল নিকাশ হত, তাকে বলা হত 'তল'। 'বাটক' বলতে চলাচলের রাস্তা বোঝাতো। 'উদ্দেশ' বলতে বোঝাতো বাঁধ। 'ঢিপি' বলতে বোঝাতো উঁচু জায়গা। 'জোলা' বলতে বোঝাতো সরু খাল—যার ভেতর দিয়ে বিল, পুকুর, নদী প্রভৃতির জল চলাচল করে। 'হজ্জিকা'র অর্থ নিচু জলাভূমি। চাষের অযোগ্য উঁচু জমিকে বলা হত 'ঊষর'। যে জমিতে গোরু-মোষ চরে বেড়ায় তাকে বলা হত 'গোচর'। লোক চলাচল ও যানবাহন চলাচলের পথকে বলা হত 'মার্গ'।

গোড়ার যুগে সহজেই জমি পাওয়া যেত। সেজন্য জমির মাপের তেমন চুলচেরা বিচার ছিল না, লোক ছিল কম, জমি ছিল প্রচুর। যার যখন দরকার, সে জংগল সাফ করে দরকার মত জমি তৈরি করে নিত। লোক-বাড়ার সাথে এই নিয়ম যায় বদলে।

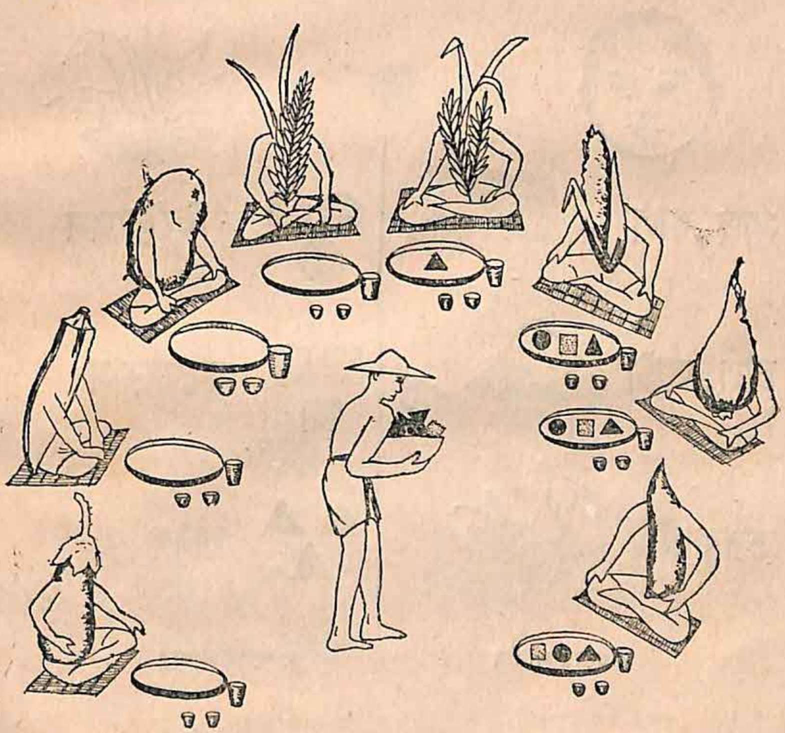
দিন দিন লোক যত বেড়েছে, ততই চাষবাসও বেড়েছে। মানুষের ধন-দৌলত আসত প্রধানত কৃষি থেকে। সেই জন্য সেকালের সমাজে ছিল কৃষকের রীতিমত খাতির।

লোক বেড়ে যাওয়ায় এখন জমির ওপর চাপ পড়েছে বেশি, আর একই জমি থেকে বার বার ফসল ফলানোর জন্য জমির উৎপাদিকা শক্তিও গেছে কমে। লোকের অনুপাতে কিন্তু জমি বাড়েনি। সেজন্য এই জমি থেকেই সকল লোকের জন্য কি করে বেশি ফসল উৎপাদন করা যায়, তাই আমাদের দেখতে হবে।

নয়

ফসলের খাদ্য

মাটি আমাদের আহারের যোগান দেয়। মাটিতে আছে নানারকম উপাদান। সেইগুলো হল ফসলের খাদ্য। আমরা যেমন মুখ দিয়ে খাই, ফসল সেই রকম শিকড় দিয়ে খায়।

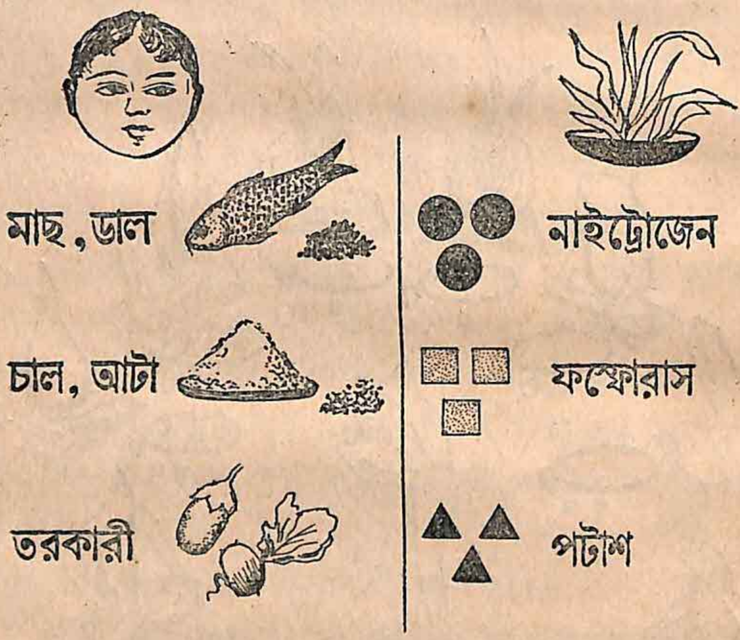


গাছেরও খাবার প্রয়োজন

শিকড় হল ফসলের মুখ। মাটিতে ফসলের খাবার উপযোগী যে সব উপাদান আছে, ফসল শিকড় দিয়ে মাটি থেকে তার রস টেনে

নেয়। ফসল ভাল খেতে পেলে, প্রতিদানে সে-ও আমাদের ভাল ফলন দিতে পারে। সেই জন্যে মাটিতে প্রচুর পরিমাণে ফসলের খাবার থাকা দরকার।

ভুললে চলবে না যে, মানুষের যেমন খাবার চাই, ফসলেরও তেমনি খাবার দরকার।

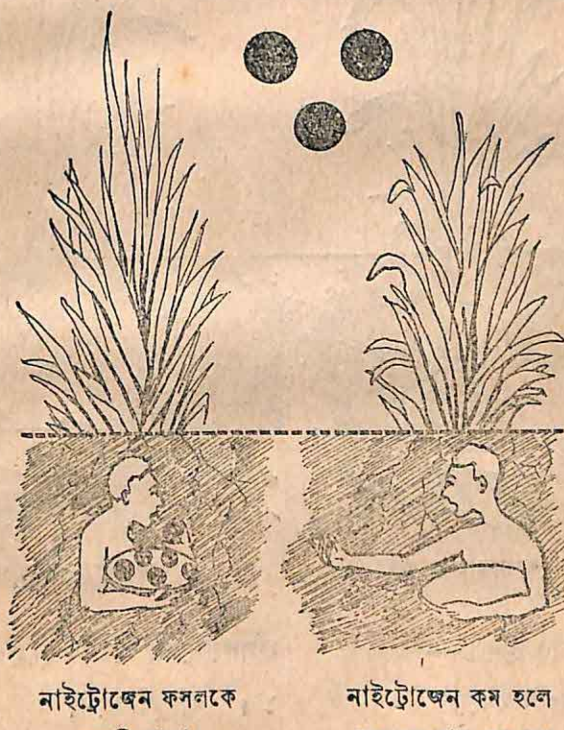


মানুষের খাবার ফসলের খাবার

নাইট্রোজেন ফসলকে জলদি বাড়ায় আর পাতায় এনে দেয় গাঢ় সবুজ রং।

নাইট্রোজেন-এ ফসলের প্রোটিন বাড়ে, গাছ গাঢ় সবুজ হয়ে ওঠে, তাদের জলদি বাড়ায় আর রসাল করে তোলে, ফলন হয় বেশি।

নাইট্রোজেন কম হলে গাছের রং হয় ফিকে সবুজ, তার বাড় যায় কমে, ফলন হয় কম।

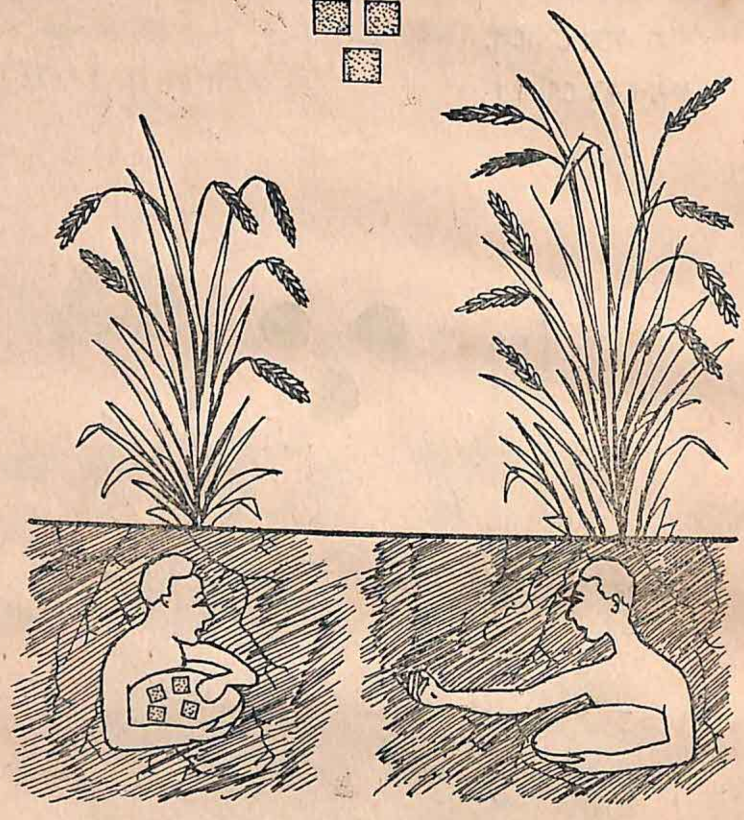


নাইট্রোজেন ফসলকে জলদি বাড়ায়

নাইট্রোজেন কম হলে ফসলের বাড় হয় কম

সুপুষ্ট দানা আর জলদি ফসল পেতে হলে ফসফরাস চাই।

ফস্ফোরাস চাই



ফসফরাসের গুণ

ফসফরাসের অভাব

ফসফরাসের গুণ :—

১। জলদি ফলন

২। সুপুষ্ট দানা

৩। মিষ্টি ফল উৎপাদন

৪। শক্ত ও অধিক শিকড়

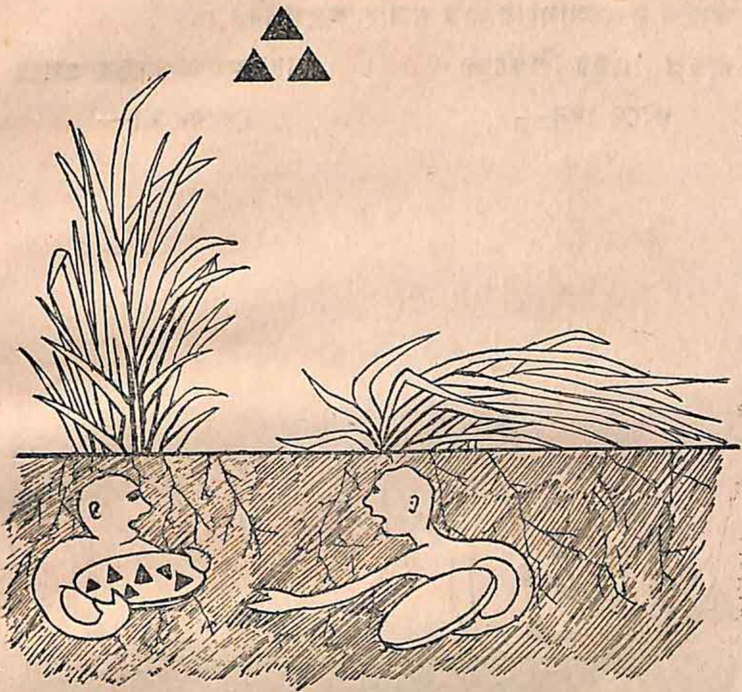
ফসফরাসের অভাব হলে :—

১। অপুষ্ট দানা

২। নাবি ফলন

৩। দুর্বল ও অল্প শিকড়

'পটাশ' করে গাছকে সবল ও সতেজ।



পটাশের গুণ পটাশের অভাব

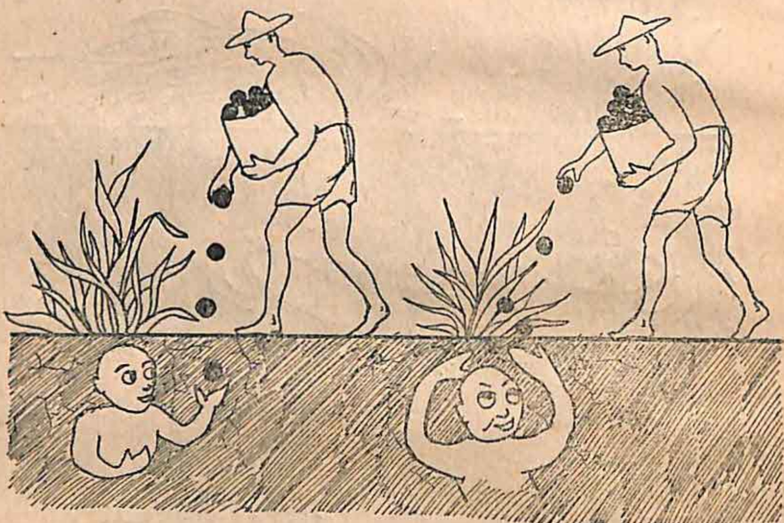
'পটাশ' ফসলের—	পটাশের অভাবে—
১। শক্তি বাড়ায়	১। গাছ দুর্বল হয়
২। রোগ-প্রতিষেধক-ক্ষমতা বাড়ায়	২। গাছ রোগা হয়
	৩। গাছ শুয়ে পড়ে

জমিতে 'নাইট্রোজেন' সরবরাহ করতে হলে 'অ্যামোনিয়ম' সালফেট নামক রাসায়নিক সার ব্যবহার করাই ভাল। তবে এর ব্যবহারের নিয়ম জানতে হয়।

একরপিছু এক মণের বেশি দিতে হলে দুই ভাগে ভাগ করে নিন। অর্ধেক দিন বীজ লাগাবার সময়, আর বাকি অর্ধেক ফসলে ফুল আসবার এক সপ্তাহ আগে দিন।

বাড়ন্ত গাছের শিকড়ের কাছে দিন—

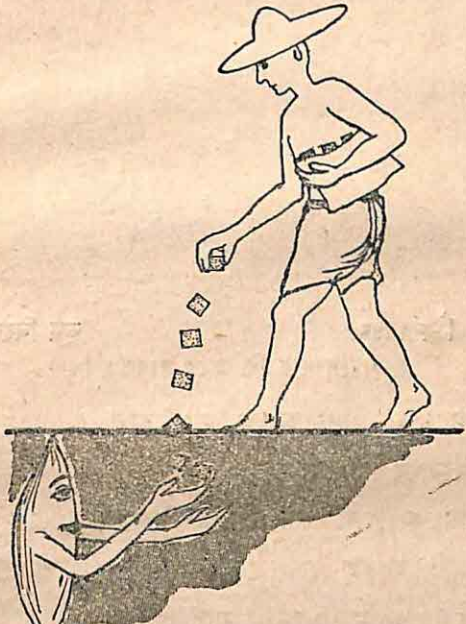
চারা অথবা গাছের ওপরে দেবেন না—



অ্যামোনিয়ম সালফেট্ ব্যবহারের নিয়ম

জমিতে ফস্‌ফেট সরবরাহ করতে হলে সুপার ফস্‌ফেট নামক রাসায়নিক সার দিয়ে করতে পারেন। তবে তার আগে এর ব্যবহারের নিয়ম জেনে নিন। এই সার বৃষ্টির জলে সহজে ধুয়ে

যায় না। সবটা সুপার ফস্‌ফেট বীজ বোনার আগে জমিতে দিন।

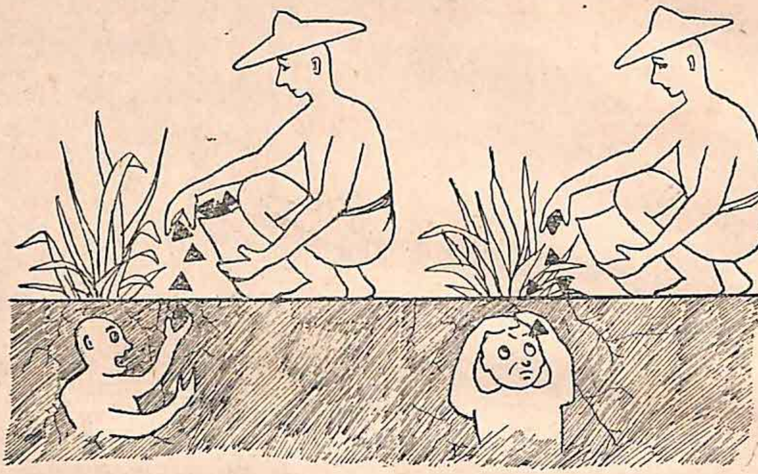


সুপার ফস্‌ফেট ব্যবহারের নিয়ম

জমিতে 'পটাশ' সরবরাহ করতে হলে 'মিউরিয়েট অব্ পটাশ' নামক রাসায়নিক সার দিয়ে করতে পারেন।

বেশি বৃষ্টি হলে এ সার ধুয়ে যেতে পারে। অনেকটা সার

ব্যবহার করতে হলে দু'-দফায় করুন। খুব সাবধানে সার দেবেন। দেখবেন যেন চারার গায়ে না লাগে।



ঠিক নিয়ম ভুল নিয়ম

পটাশ সার কি ভাবে ব্যবহৃত হয়

এমন অনেক সার আছে, যা তৈরি করা হয়েছে এই তিন রকম সার মিলিয়ে।

এই সারকে বলা হয় 'সুষম' সার। এর মানে—এতে গাছের তিনটি সারই মেশানো আছে। পশ্চিম বঙ্গ কৃষি-বিভাগের এই রকম একটা সার আছে। তার নাম—"মিশ্র সার।"

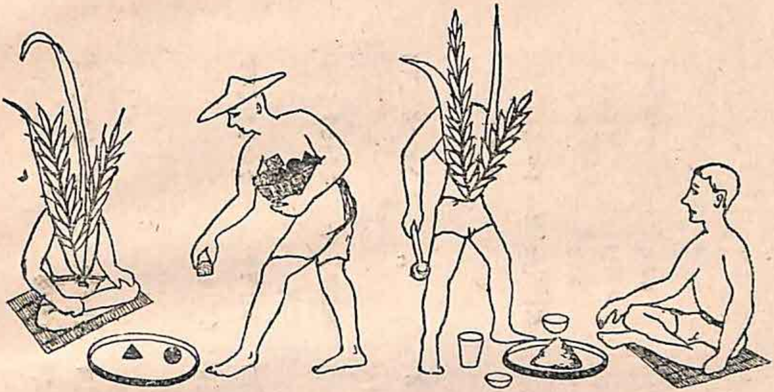
এই সব রাসায়নিক সার ছাড়া আর এক রকম সার আছে। তার নাম জৈব সার। সেগুলো হল—

১। গোবর সার ৩। কচুরি পানার সার

২। তলানি সার ৪। সবুজ সার

এইবার আর একটি দরকারী কথা বলবো। জমিতে রাসায়নিক সার দিতে হলে তার আগে জৈব-সার দিয়ে নিতে

হবে। আর জমিতে যখন রাসায়নিক সার দেওয়া হবে, তখন জমিতে যেন বেশ রস থাকে। জমিতে রস টান পড়লে রাসায়নিক সার দেওয়া চলবে না।



গাছকে ভাল খেতে দিন গাছও আপনাকে খাওয়াবে

এই ভাবে জমির মারফত গাছকে ভালভাবে খেতে দিন। তাহলে গাছও আপনাকে ভালভাবে খাওয়াবে।

দশ

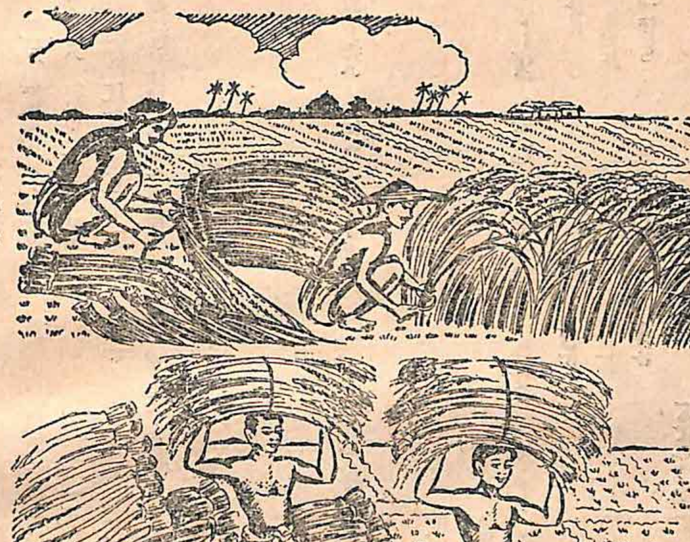
কৃষি পঞ্জি

মাটি আমাদের ফসল দান করে—এ কথা ঠিক। তবে কোন্ ফসল কোন্ সময় লাগাতে হয় তা যদি আমরা না জানি, তা হলে আমাদের ফসল উৎপাদনের অসুবিধে হয়। সেই জন্যে সে কথাটি আগে জানতে হবে।

এক বছরে আমাদের খন্দ আছে দুটি—একটি খরিফ, আর একটি রবি। বৈশাখ থেকে আশ্বিন পর্যন্ত হল খরিফ মরশুম, আর কার্তিক থেকে চৈত্র পর্যন্ত রবি মরশুম। এই দুই মরশুমে কি কি ফসল লাগান যায়, এবার বলছি সেই কথা।

ধান

ফসল	জমি	বোনার সময় ও নিয়ম	ফসল কাটার সময়	একর পিছু বীজের হার	একর পিছু আনুমানিক ফলন
আউশ ধান (বোনা)	বেলে দো-আঁশ ও এঁটেল	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে ছিটিয়ে বুনতে হয়।	শ্রাবণ-ভাদ্র	৩০ সের-১ মণ	১৫-১৮ মণ
" (রোয়া)	"	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে বীজ বীজতলায় ফেলে আষাঢ়-শ্রাবণে রোয়া লাগাতে হয়।	"	১০-১৫ সের	১৫-২০ মণ
আমন ধান (বোনা)	দো-আঁশ	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে ছিটিয়ে বুনতে হয়।	অগ্রহায়ণ-মাঘ	২৫-৩৫ সের	২০-৩০ মণ
" (রোয়া)	"	জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে বীজতলায় বীজ ফেলতে হয়। সেই চারার রোয়া লাগাতে হয় শ্রাবণ মাসে।	কার্তিক-পৌষ	১০-১৫ সের	২০-৩০ মণ
বোরো ধান	পলিমাটি	অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে বীজতলায় বীজ ফেলে পৌষ মাসে রোয়া লাগাতে হয় —১২ ইঃ × ১২ ইঃ ব্যবধানে।	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	১০-১৫ সের	১৫-২৫ মণ



ধান

ধান জাতীয় অন্য ফসল

ফসল	জমি	বোনার সময় ও নিয়ম	ফসল কাটার সময়	একর পিছু বীজের হার	একর পিছু আনুমানিক ফলন
গম	উঁচু দো-আঁশ	কার্তিক মাসের মাঝামাঝি থেকে অগ্রহায়ণের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ৯ ইঃ × ১২ ইঃ অন্তর সারিতে বীজ বুনতে হয়।	ফাল্গুন	২৪—২৭ সের	১২—২০ মণ
যব	দো-আঁশ ও বেলে দো-আঁশ	কার্তিক মাসে বীজ ছিটিয়ে বুনতে হয়।	„	৩০—৪০ সের	১২—১৮ মণ

অন্য খাদ্য শস্য

কাজু বাদাম	বেলে ও পতিত জমি	জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে প্রথম বৃষ্টি হলে মাটিতে ৬—১২ ইঃ গভীর গর্তে প্রতি গর্তে ২-৩টি করে বাদাম বসাতে হয়।	৪—৬ বছর পর	একটা বেশ ভাল গাছে বছরে ১৷৷০ মণ বাদাম পাওয়া যায়। এর থেকে প্রায় ১৫-১৬ সের কাজু বাদামের শাঁস পাওয়া যায়।

ডাল শস্য

ফসল	জমি	বোনার সময় ও নিয়ম	ফসল কাটার সময়	একর পিছু বীজের হার	একর পিছু আনুমানিক ফলন
খেঁসারি	এঁটেল	কার্তিক মাসে বীজ ছিটিয়ে বুনতে হয়।	ফাল্গুন	১২—১৫ সের	১০—১২ মণ
ছোলা	”	”	”	১২—১৮ সের	১২—১৮ মণ
মসূর	”	”	”	১২—১৫ সের	৮—১২ মণ
মটর	”	”	”	১৫—২০ সের	১০—১২ মণ
মুগ	উঁচু হালকা জমি (জল দাঁড়ায় না)	আশ্বিন-কার্তিক	পৌষ	৮—১০ সের	”
সয়াবীন বা গেঁড়ি কলাই	দো-আঁশ ও এঁটেল দো-আঁশ	জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ে ছিটিয়ে অথবা লাইনে।	”	ছিটিয়ে বুনলে ১০ সের, লাইনে ৭॥০ সের	৫—১০ মণ
অড়হর	দো-আঁশ ও বেলে (জল দাঁড়ায় না)	শ্রাবণ-ভাদ্রে লাইনে বীজ বুনতে হয়।	মাঘ-ফাল্গুন	৬—৯ সের	৮—১২ মণ
মাসকলাই	দো-আঁশ ও এঁটেল	শ্রাবণ-ভাদ্রে বীজ ছিটিয়ে বুনতে হয়।	কার্তিক-অগ্রহায়ণ	৬—৯ সের	৬—৮ মণ

তৈল বীজ

ফসল	জমি	বোনার সময় ও নিয়ম	ফসল কাটার সময়	একর পিছু বীজের হার	একর পিছু আনুমানিক ফলন
সরষে	দো-আঁশ	আশ্বিন-কার্তিকে বীজ ছিটিয়ে বুনতে হয়।	মাঘ-ফাল্গুন	৪—৪৷৷০ সের	৫—৮ মণ
চীনাবাদাম	বেলে দো-আঁশ (ঝুর-ঝুরে মাটি দরকার)	বৈশাখ—আষাঢ়ে ৯ ইঞ্চি অন্তর বীজ বসাতে হয়।	আশ্বিন-অগ্রহায়ণ	১৮—২০ সের	২০—৩০ মণ
তিসি	দো-আঁশ	কার্তিক মাসে বীজ ছিটিয়ে বুনতে হয়।	ফাল্গুন	৪৷৷—৬ সের	৮—১০ মণ
রেড়ি	উঁচু দো-আঁশ	আশ্বিন-কার্তিকে ৪ হাত অন্তর বীজ বুনতে হয়।	ফাল্গুন-চৈত্র	৪৷৷—৬ সের	১০—১২ মণ

কন্দ ফসল ও শাক-সবজি

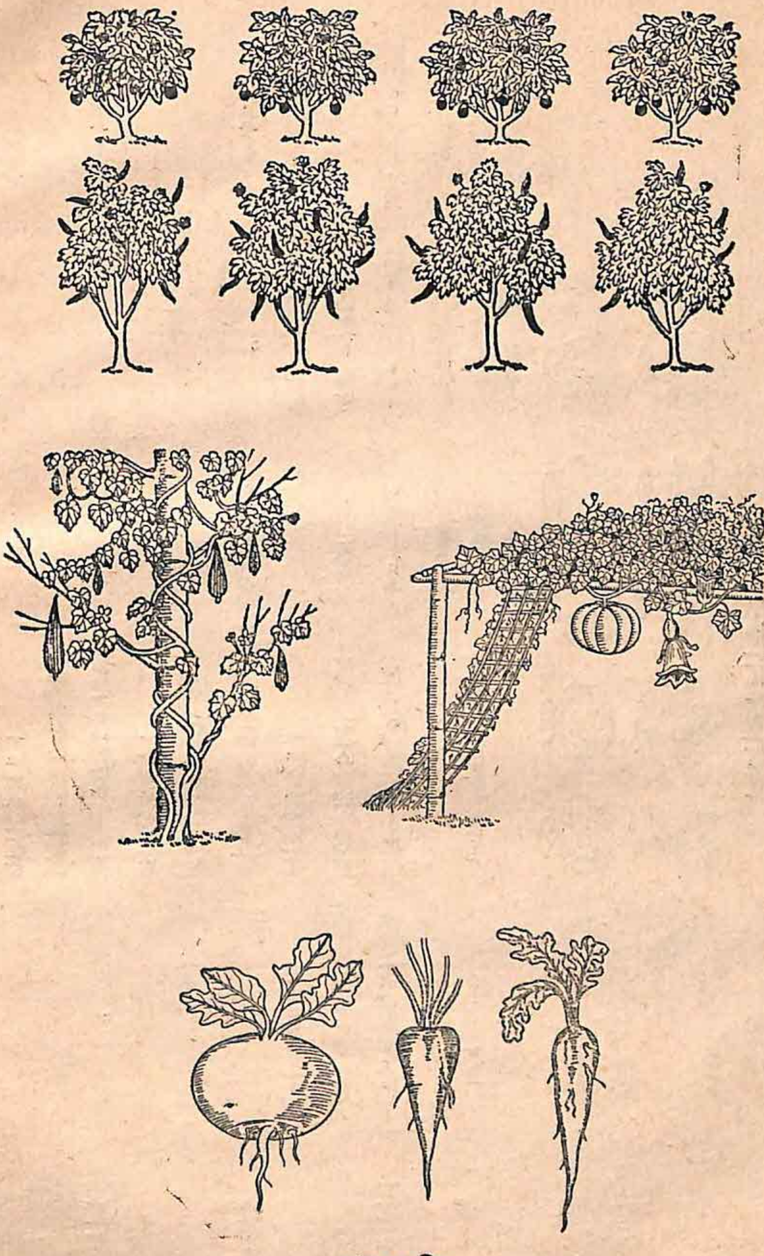
আলু	উর্বর বেলে দো-আঁশ	আশ্বিন-কার্তিকে ৯ ইঃ দূরে দূরে বীজ লাগাতে হয়।	ফাল্গুন-চৈত্র	৬—১০ মণ	ফসল ভাল হলে মোটামুটি ৩০০ মণ পর্যন্ত

ফসল	জমি	বোনার সময় ও নিয়ম	ফসল কাটার সময়	একর পিছু বীজের হার	একর পিছু আনুমানিক ফলন
বেগুন	উঁচু দো-আঁশ (জল দাঁড়ায় না)	ফাল্গুন-আষাঢ়ে ১৷৷-২ হাত অন্তর সারি করে প্রতি সারিতে ১৷৷০ হাত পর পর চারা লাগাতে হয়।	লাগানোর ৩-৪ মাস পর থেকে বেগুন ধরা শুরু হয় ও তখন থেকে তোলা যায়।	৪—৬ ছটাক	১২০—১৮০ মণ
ঢেঁড়স	দো-আঁশ	চৈত্র-বৈশাখে ১ হাত অন্তর ২-৩ আঙুল গভীর নালি করে তার মধ্যে ½ হাত দূরে দূরে ২-১টি করে বীজ ফেলতে হয়।	বীজ বোনার ২-৩ মাসের মধ্যেই ঢেঁড়স ধরে ও তখন থেকে তোলা চলে।	৪৷৷-৫ সের	৬০—৮০ মণ
লাউ	দো-আঁশ	চৈত্র-আষাঢ় ও ভাদ্র-কার্তিক	৩-৪ মাস পর	৵৷৷০—৶৹০	১০০—১৫০ মণ
কুমড়ো	”	”	”	”	”
চাল কুমড়ো	”	ফাল্গুন-চৈত্র	”	১—১৷৷ সের	১০০—১২৫ মণ

ফসল	জমি	বোনার সময় ও নিয়ম	ফসল কাটার সময়	একর পিছু বীজের হার	একর পিছু আনুমানিক ফলন
চিচিঙ্গা	দো-আঁশ	চৈত্র-আষাঢ়	শ্রাবণ-আশ্বিন	১—১॥ সের	১০০—১২৫ মণ
ঝিঙ্গা	”	”	২—৩ মাস পর	১৷৷—২ সের	১০০—১৫০ মণ
করলা	”	ফাল্গুন—জ্যৈষ্ঠ	৩ মাস পর	/৸—১ সের	১০০—১২৫ মণ
কাঁকরোল	বেলে দো-আঁশ	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	৩—৪ মাস পর	”	”
কাঁকড়ি	”	চৈত্র-বৈশাখ	আষাঢ়-শ্রাবণ	৮—১২ ছটাক	৯০—১০০ মণ
শিম	”	জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়	অগ্রহায়ণ-পৌষ	৪॥—৬ সের	১০০—১৩০ মণ
বাকলা-শিম	দো-আঁশ	আষাঢ়-শ্রাবণ	৩ মাস পর	৪—৬ সের	”
চুকারি	”	চৈত্র-বৈশাখ	৫ মাস পর	৩—৪ সের	৫০—৮০ মণ
মেটে আলু	বেলে দো-আঁশ	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	৮—৯ মাস পর	১০—১৫ মণ	১০০—১৮০ মণ
শিমুল আলু	”	চৈত্র-বৈশাখ	”	৬,০০০ ডগা	৩০০ মণ
মুলা	ঝুরঝুরে বেলে দো-আঁশ বা দো-আঁশ	শ্রাবণ—কার্তিকে বীজ ছিটিয়ে বুনতে হয়।	১—১॥ মাস পর	২—৪ সের	১৫০—২০০ মণ

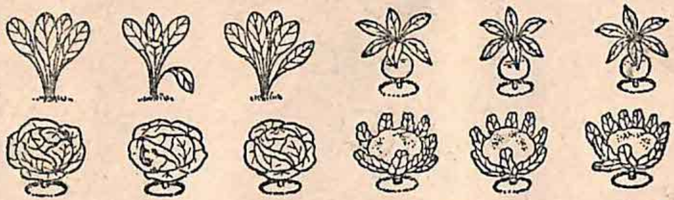
ফসল	জমি	বোনার সময় ও নিয়ম	ফসল কাটার সময়	একর পিছু বীজের হার	একর পিছু আনুমানিক ফলন
কচু	বেলে দো-আঁশ বা এঁটেল	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে ১॥-২ ফিট অন্তর মুখী লাগাতে হয়।	ভাদ্র-কার্তিক	৪॥—৬ মণ মুখী	২০০—২২৫ মণ
মানকচু	বেলে দো-আঁশ	বৈশাখ—আষাঢ়ে ২-২॥ ফিট অন্তর মূল বসাতে হয়।	পৌষ—ফাল্গুন	৬,০০০-৭,০০০ মূল	”
ওল	”	জ্যৈষ্ঠ মাসে ১॥-২ হাত অন্তর গর্তে মুখী লাগাতে হয়।	৬ মাস পর	৬—৯ মণ মুখী	”
উচ্ছে	দো-আঁশ	ফাল্গুন-চৈত্রে ৩—৪ ফিট অন্তর বীজ বুনতে হয়।	আষাঢ়-শ্রাবণ	১২ ছটাক— ১ সের	১০০—১৫০ মণ
পটল	উঁচু ঘেলে দো-আঁশ	ভাদ্র-আশ্বিনে ৩ হাত অন্তর সারি দিয়ে প্রতি সারিতে ৩-৪ হাত ব্যবধানে মাদা তৈরি করে ২-৩টি সরু পটল মূল গোবর জলে ডুবিয়ে গ্রন্থি ওপরে রেখে বসাতে হয়।	মাঘ-ফাল্গুন	”	৯০ মণ

ফসল	জমি	বোনার সময় ও নিয়ম	ফসল কাইার সময়	একর পিছু বীজের হার	একর পিছু আনুমানিক ফলন
রাঙ্গা আলু	বেলে দো-আঁশ	ভাদ্র—কার্তিকে ৩ ফিট অন্তর 'কার্টিং' লাগাতে হয়।	মাঘ—চৈত্র	৩,০০০—৬,০০০ কার্টিং	১২৫—১৮০ মণ
পালম শাক	দো-আঁশ	ভাদ্র—অগ্রহায়ণে বীজ ছিটিয়ে বুনতে হয়।	২ মাস পর		৮০—৯০ মণ
পুঁই শাক	”	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে মাদায় ৫-৬টি বীজ বুনতে হয়। ডাঁটাও লাগানো যায়। ডাঁটা লাগাতে হলে বর্ষাকালই প্রশস্ত।	”	৬০ তোলা	১০০—১২৫ মণ
ডাঁটা শাক	”	ফাল্গুন-আষাঢ়	”	”	



শাক-সবজি

বিলাতী শাক-সবজি



ফসল	জমি	বোনায় সময় ও নিয়ম	ফসল কাটার সময়	একর পিছু বীজের হার	একর পিছু আনুমানিক ফলন
বাঁধা-কপি	দো-আঁশ, এঁটেল দো-আঁশ বা বেলে দো-আঁশ	ভাদ্র—কার্তিকে চারা দিয়ে পরে চারা তুলে লাগাতে হয়।	৮০—১২০ দিনে	২০০ হাত লম্বা এক লাইনের জন্য এক আউন্স	১৮০—২০০ মণ
ফুলকপি	”	শ্রাবণ—অগ্রহায়ণে চারা দিয়ে পরে চারা তুলে লাগাতে হয়।	৬০—১২০ দিনে	”	১৫০—১৮০ মণ
ওলকপি	”	ভাদ্র—কার্তিকে চারা দিয়ে পরে চারা তুলে লাগাতে হয়।	১৷৷—২ মাস পরে	”	১২০—১৫০ মণ

ফসল	জমি	বোনার সময় ও নিয়ম	ফসল কাটার সময়	একর পিছু বীজের হার	একর পিছু আনুমানিক ফলন
গাজর	ঝুরঝুরে বেলে দো-আঁশ বা দো-আঁশ	ভাদ্র—অগ্রহায়ণ	২॥০—৩ মাস পরে	২০০ হাত লম্বা এক লাইনের জন্য ১॥ আউন্স	৮০—৯০ মণ
শালগম	”	”	২-৩ মাস পরে	”	”
বীট	”	”	”	২০০ হাত লম্বা এক লাইনের জন্য ৩ আউন্স	”
টম্যাটো	দো-আঁশ মাটি উৎকৃষ্ট। বেলে দো-আঁশ ও এঁটেল দো-আঁশ মাটিতেও মোটামুটি ভাল হয়।	”	”	২০০ হাত লম্বা এক লাইনের জন্য ½ আউন্স	১২৫—১৫০ মণ

মশলা

ফসল	জমি	বোনার সময় ও নিয়ম	ফসল কাটার সময়	একর পিছু বীজের হার	একর পিছু আনুমানিক ফলন
লঙ্কা	দো-আঁশ	বৈশাখ—আষাঢ়	পৌষ—ফাল্গুন	২—৪ ছটাক	২৫—৪০ মণ
হলুদ	বেলে দো-আঁশ	চৈত্র-বৈশাখে—১॥ হাত অন্তর লাইন করে প্রতি লাইনে আধ হাত পর পর মূল বসাতে হয়।	অগ্রহায়ণ-পৌষ	২—৩ মণ মূল	২০—২৫ মণ (শুক্‌নো হলুদ)
আদা	”	”	”	”	৮০—১০০ মণ
গোলমরিচ	নিচু সরস জমি	জ্যৈষ্ঠ	৩-৪ বছর পরে	১,০০০ ‘কাটিং’	প্রতি লতায় গড়ে ১ সের
পিঁপুল	বেলে দো-আঁশ	শ্রাবণ	পৌষ—ফাল্গুন	৪০০—৪৫০ লতা	৬ মণ
পিঁয়াজ	হালকা বেলে দো-আঁশ	কার্তিক মাসে, ৯—১২ ইঃ অন্তর লাইনে ৬—৭ ইঃ অন্তর চারা লাগাতে হয়।	ফাল্গুন—বৈশাখ	৮—১৬ ছটাক বীজ বা ৪—৬ মণ মূল	১৫০—১৮০ মণ
রসুন	”	”	”	৩০ সের—১ মণ মূল	১২৫—১৫০ মণ
জোয়ান	বেলে দো-আঁশ	আশ্বিন—অগ্রহায়ণে বীজ ছিটিয়ে বুনতে হয়।	ফাল্গুন	৬ সের	৩—৪ মণ
ধনে	দো-আঁশ	”	”	৬—১০ সের	৪—৬ মণ

ফসল	জমি	বোনার সময় ও নিয়ম	ফসল কাটার সময়	একর পিছু বীজের হার	একর পিছু আনুমানিক ফলন
৩ মৌরী	বেলে দো-আঁশ	ভাদ্র—কার্তিকে বীজ ছিটিয়ে বুনতে হয়।	ফাল্গুন	৪—৬ সের	৪—৬ মণ
মেথি	”	আশ্বিন-কার্তিকে বীজ ছিটিয়ে বুনতে হয়	৩ মাস পর	৬—১০ সের	৫—৮ মণ
জিরা	”	”	৪ মাস পর	৩—৬ সের	৩—৪ মণ
		আঁশ ফসল			
পাট	দো-আঁশ	চৈত্র—আষাঢ়	আষাঢ়—ভাদ্র	৩—৪॥০ সের	১৫—২৫ মণ
শণ	এঁটেল ও দো-আঁশ	চৈত্র—জ্যৈষ্ঠ	শ্রাবণ—আশ্বিন	৪০—৫০ সের	১৫—২০ মণ
রিয়া	”	চৈত্র—জ্যৈষ্ঠে ২ ফিট × ২ ফিট অন্তর 'কার্টিং' লাগাতে হয়।	”	৪৫,০০০—৬০,০০০ 'কার্টিং'	৪০,০০০ পাউণ্ড থেকে ৪৫,০০০ পাউণ্ড
কার্পাস	উঁচু সারবান জমি (জল দাঁড়ায় না)	বৈশাখ—আষাঢ়ে ২॥ ফিট অন্তর লাইন করে প্রতি লাইনে ২॥ ফিট পর পর ১॥-২ ইঃ গভীর গর্তে ২-৩টি বীজ বুনতে হয়।	ফাল্গুন-চৈত্র	৬—৮ সের	২—২॥০ মণ

মুখশুদ্ধি

ফসল	জমি	বোনার সময় ও নিয়ম	ফসল কাটার সময়	একর পিছু বীজের হার	একর পিছু আনুমানিক ফলন
পান	দো-আঁশ	জ্যৈষ্ঠ—শ্রাবণে ৩ ফিট অন্তর লাইন করে প্রতি লাইনে ২ ফিট অন্তর 'ল' বসাতে হয়। (রবিশস্য হিসাবেও লাগানো যায়)	আশ্বিন—অগ্রহায়ণ	৩,০০০ 'ল'	৭০—৮০ কাহন
শুপারি	দো-আঁশ	৩ ফুট চওড়া ২০ ফুট লম্বা ও ৬ ইঃ উঁচু বীজক্ষেতে ৯ ইঃ অন্তর সারিতে ১ ইঃ মাটির নিচে বীজ বুনে চারা তৈরি করতে হয়। সেই চারা বর্ষার প্রথমে তুলে লাগাতে হয়।	চারা লাগানোর ৬—৭ বছর পরে	—	গড়ে প্রতি গাছে বছরে ১০০ শুপারি পাওয়া যায়

চিনি

ফসল	জমি	বোনার সময় ও নিয়ম	ফসল কাটার সময়	একর পিছু বীজের হার	একর পিছু আনুমানিক ফলন
আখ	এঁটেল ও দো-আঁশ	কার্তিক-অগ্রহায়ণ অথবা মাঘ-ফাল্গুনে 'কাটিং' বসাতে হয়।	পৌষ থেকে (পরের বছর)	১২,০০০ 'কাটিং'	৬০—৮০ মণ গুড়

ফল

ফলের নাম	জমি	বোনার সময় ও নিয়ম	ফল পাবার সময়	প্রতি গাছে ফলে
আম	গভীর পলিমাটি অথবা দো-আঁশ মাটি	আষাঢ়-শ্রাবণে জোড়-কলম বসাতে হয়। ফলের বাগানের জন্য ৩০-৪০ ফুট অন্তর ৩ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া ও ৩ ফুট গভীর গর্ত করে তার মধ্যে কলম বসাতে হয়। আঁটি থেকে চারা তৈরি করেও লাগানো চলে।	কলমের গাছ লাগানোর ৪ বছর পরে ফলন আরম্ভ হয়।	৪র্থ বছরে আমের গাছে প্রায় ১০-১২টি ফল ধরে। ৬ বছরে ৫০-৬০টি এবং ১০ বছরে যদি ফলন ভাল হয় তবে ৩০০-৪০০টি
কাঁঠাল	”	আষাঢ়-শ্রাবণে গুটি কলম লাগাতে হয়। বিচি থেকে চারা তৈরি করেও লাগানো চলে। কাঁঠালের চারা ৩০ ফুট অন্তর লাগাতে হয়।	লাগানোর ৪—৬ বছর পরে ফল ধরে	
লিচু	দো-আঁশ অথবা বেলে দো-আঁশ	আষাঢ়-শ্রাবণে গুটি কলম করে ৩০ ফুট অন্তর লাগাতে হয়।	”	

ফলের নাম	জমি	বোনার সময় ও নিয়ম	ফল পাবার সময়
জামরুল	দো-আঁশ অথবা বেলে দো-আঁশ	আষাঢ়-শ্রাবণে দাবা কলম করে লাগাতে হয়। গুটি কলম করেও লাগানো চলে। বাগানে ৩০ ফুট অন্তর কলম বসাতে হয়।	লাগানোর ৩-৪ বছর পরে
কালো জাম	”	আষাঢ়-শ্রাবণে বীজ থেকে বা কলম করে লাগানো চলে। বাগানে ৩০ ফুট অন্তর বসাতে হয়।	লাগানোর ৪-৬ বছর পরে
গোলাপ জাম	”	আষাঢ়-শ্রাবণে দাবা কলম বা গুঁটি কলম করে লাগাতে হয়। বাগানে ২০ ফুট অন্তর বসাতে হয়।	”
বেল	প্রায় সব রকম মাটিতেই	বীজ ও কলম	লাগানোর ৪-৫ বছর পরে
কুল	”	বীজ ও কলম	লাগানোর ২-৩ বছর পরে



ফলের নাম	জমি	বোনার সময় ও নিয়ম	ফসল কাটার সময়	একর পিছু বীজের হার	একর পিছু আনুমানিক ফলন
নারিকেল	পুকুর, ডোবা প্রভৃতির ধারে ভাল হয়।	বৈশাখ—আষাঢ়ের মধ্যে নারিকেল পুঁততে হয়। ৯-১০ মাসের মধ্যে অঙ্কুর বেরোয়। যেখানে লাগাতে হবে সেখানে ৩০ ফুট অন্তর ৩ ফুট গভীর গর্ত করে তাতে চারা বসাতে হয়।	৬—৮ বছরে		
কলা	উঁচু দো-আঁশ	বৈশাখ-জ্যেষ্ঠে তেউড় ১॥ ফিট চওড়া ও ১॥ ফিট গভীর গর্তে ৮ হাত অন্তর লাগাতে হয়।	লাগানোর ১০—১২ মাস পরে	৩০০—৪০০ তেউড়	৩০০—৪০০ ছড়া
পেঁপে	উঁচু দো-আঁশ	জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ে বীজতলায় বীজ বুনতে হয়। চারা যখন ৩-৪ পাতার হয়, তখন তুলে ৬-৮ ফিট অন্তর বসাতে হয়।	৮—১০ মাস পর	৪—৬ তোলা	

ফলের নাম	জমি	বোনার সময় ও নিয়ম	ফসল কাটার সময়	একর পিছু বীজের হার	একর পিছু আনুমানিক ফলন
আনারস	বেলে দো-আঁশ ও এঁটেল	আষাঢ়—আশ্বিনে তেউড় ১॥×২ হাত অন্তর লাইনে ১॥ হাত অন্তর লাগাতে হয়।	১৮ মাস পর	৮,০০০-১০,০০০ আনারস	প্রতি গাছে একটি করে ফল হয়।
শসা	বেলে দো-আঁশ	চৈত্র-বৈশাখে ৫-৬ ফিট অন্তর বীজ বুনতে হয়। (রবিশস্য হিসাবেও বোনা যায়)	৩ মাস পর	৬—৮ তোলা	১০০—১২০ মণ
তরমুজ	বেলে	আশ্বিন—মাঘে ৪ ফিট অন্তর বীজ বুনতে হয়।	৩-৪ মাস পর	৪—৬ ছটাক	১২৫—১৮০ মণ
ফুটি	বেলে	আশ্বিন—মাঘে ৪ ফিট অন্তর বীজ বুনতে হয়	৩-৪ মাস পর	৫-৬ ছটাক	১০০—১২৫ মণ
খরমুজা	”	”	”	৪ ছটাক	১২৫—১৫০ মণ
পেয়ারা	হালকা দো-আঁশ ও এঁটেল	আষাঢ়-শ্রাবণে বীজ অথবা গুটি বা জোড় কলম করে।	২-৩ বছর পর		

ফলের নাম	জমি	বোনার সময় ও নিয়ম	ফসল কাটার সময়	একর পিছু বীজের হার	একর পিছু আনুমানিক ফলন
লেবু জাতীয় ফল (পাতি লেবু, কাগজি লেবু, বাতাবি লেবু, সরবতী লেবু প্রভৃতি)	যে কোন মাটিতে যেখানে ভাল জল নিকাশ হয়	বীজ অথবা গুটি কলম	কলমের গাছে ২-৩ বছরে	—	—
আতা	বেলে ও বেলে দো-আঁশ	বর্ষায় বীজ অথবা জোড় কলম করে।	৫-৬ বছর পর	—	—
নোনা	”	বর্ষায় বীজ অথবা ডাল কলম করে।	”		

এগার

বেশি ফসল ফলান

ধানের বেশি ফসল পাওয়ার কয়েকটি উপায়

- বীজ বোনার জন্য উঁচু বীজতলা তৈরি করুন।
- বীজতলায় উপযুক্ত সার দিন।
- রোগ প্রতিরোধ করতে পারে এবং বেশি ফলন হয় এমন বীজ ব্যবহার করুন।
- খুব বেশি বীজ বুনবেন না।
- রোয়া দেওয়ার সময় অল্প চারা দিয়ে গুছি করুন।
- যথেষ্ট জৈব ও রাসায়নিক সার দিন।
- রোগ-পোকা থেকে গাছগুলিকে বাঁচান।

উৎপাদন বাড়ানোর সাতটি উপায়

- ভালো জাতের বীজ বুনুন।
- বীজতলা ভালোভাবে তৈরি করুন।
- সমস্ত আবর্জনা দিয়ে সার তৈরি করুন।
- উপযুক্ত সেচ দিন।
- ভালো কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন।
- জমি থেকে আগাছা দূর করুন।
- ফসলকে রোগ-পোকার হাত থেকে বাঁচান।
